ved by the Board of Secondary Education, West Bengal, as a
li Rapid Reader for Class VIII of Secondary Schools of West
Bengal. Vide Notification No. Syl./51/55, dated the 17th
October, 1955 and Calcutta Gazette dated 24. 11. 55.

# কাব্য-মালঞ্চ

[ অষ্টম শ্রেণীর দ্রুত পঠনের জন্য ]

সঙ্কলয়িতা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

বাংলা ভাষার শিক্ষক, তালতলা উচ্চ বিদ্যালয়, কলিকাতা

ক্যালকাটা বুক ষ্টোরস্
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
২০৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

# সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

## ঈশ্বর-স্তোত্র ও প্রার্থনা



## বর্ষ-বোধন



## মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

বিষয় পৃষ্ঠা

## দেশপ্রেমাত্মক কবিতা



## বিশ্বপ্রকৃতি



## কবিত্ব



## সাম্য ও মৈত্রী

বিষয় পৃষ্ঠা

মানবতা



জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ



হাস্য-কৌতুক



মৃত্যু



মনীষি-মঙ্গল



---

# ঈশ্বর-স্তোত্র ও প্রার্থনা



## প্রণতি

এক যিনি অদ্বিতীয়, অখিল বিশ্বের নাথ,
সকল মানব সন্তান যাঁর, তাঁরে করি প্রণিপাত,
করি বিনয়ে প্রণিপাত।
সকলের শির তাঁহার চরণে একত্র হইলে নত,
সকল গর্ব্ব দম্ভ ও দ্বেষ নিমেষে হইবে হত ;
সকলের তিনি পিতা ও পালক, বন্ধু অপক্ষপাত,
অসীম জ্ঞানের, প্রাণের উৎস, আছেন সবারি সাথ।
করি তাঁরে প্রণিপাত।
তাঁরে পিতা জানি, তাঁরে প্রভু মানি', চিনিব মানুষ ভাই ;
তাঁর স্নেহ-কোলে হেরিব সকলে, জাতি-বর্ণ-ভেদ নাই ;
তখন ধরিব, মাগিয়া কল্যাণ, সকলে সবার হাত,
আসিছে সে শুভ পুণ্যের যুগ, আসিছে সুপ্রভাত।
করি তাঁরে প্রণিপাত।

—কামিনী রায়

# প্রার্থনা

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# কামনা

হে মোর দেবতা, প্রভু, মম চিত্ত-মাঝে
প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে।
ব্যথা দিয়ে, দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার
আঘাতে আঘাতে কর মহৎ উদার।
শক্তি মোরে দাও, প্রভু, যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা-সম।
শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ভুলি যেন, নাথ,
কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ।
দারিদ্র্য কেন গো রবে ? কেন অত্যাচার
তোমার দয়ার রাজ্যে ? কেন অবিচার
সুন্দর ভুবনে তব ? হে আমার প্রভু,
প্রেমমাঝে হিংসা কেন জেগে রয় তবু ?
দূর কর, দূর কর সর্ব্ব আবর্জ্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমার মার্জ্জনা !

—হুমায়ুন কবীর

---

# প্রার্থনা

তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে !
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনলে অনিলে, চির নভোনীলে,
ভূধর-সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায়, জলদের গায়,
শশি-তারকায়, তপনে ;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
ব'সে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

—রজনীকান্ত সেন

## নববর্ষ

নব বৎসরে করিলাম পণ,—
লব স্বদেশের দীক্ষা ;
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত লব শিক্ষা !
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা !
নব বৎসরে করিলাম পণ,
লব স্বদেশের দীক্ষা !

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত' কুটীর
কল্যাণে স্থপবিত্র ।

না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে-ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হ'তে যত দূরে গেছি সরে'
তোমারে দেখেছি তত ছোট করে ;
কাছে দেখি আজ হে হৃদয়-রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র!
হে তাপস, তব পর্ণ-কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র!

পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা!
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা!
কিছু নাহি গণি', কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থি মজ্জা!
পরের বুলিতে, তোমারে ভুলিতে,
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা!

সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা!

তব পদতলে বসিয়া বিরলে,
শিখিব তোমার শিক্ষা !
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম,
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া,
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা !

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

## বৈশাখী

বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
দেব-করুণায় মাখা,
মর্ত্ত্য-লোকের দুয়ারে রোপিত
কল্পতরুর শাখা।
চম্পকে তুমি ফুল ধরায়েছ,
রসালে রঙীন ফল ;
দীপ্তি তোমার জপের মন্ত্র,
ঝঞ্ঝা তোমার ছল ।

কে বলে তোমায় রিক্ত ? তুমি যে
সত্য যুগের আদি,
আলো-শতদল হৃদয়ে তোমার
তুমি হে ব্রহ্মবাদী।
মহেশেরে তুমি পূজেছ পূজিছ
বৈশাখী চাঁপা-ফুলে,
কৌতুক তব কাল-বৈশাখী,
ধ্বজা তব মেঘে ধুলে।

ভারতে করিলে তুমি প্রবুদ্ধ
বুদ্ধেরে দিলে আনি,
এশিয়ার আলো চুমিল প্রথম
তোমার ললাটখানি।
হেম-চম্পক বরণ-বিভায়
ছাইল ধরণীতল,
শিবের চরণে পড়িল তোমার
অমল চাঁপার দল।

জগতের কবি প্রভাময় রবি
তোমারই অঙ্কে শোভে,
চন্দ্রলোকের চকোর মরতে
যার গীত-সুধা লোভে।

চম্পা-পেলব গানগুলি যার
পুলকে আলোক ছায়,—
হাজার হাজার চাঁপা-ফুল পড়ে
সুন্দর-শিব-পায়।

বিশাখা তারায় জন্ম তোমার
নাম তব বৈশাখ,
মধু দান তুমি দিলে দুনিয়ায়
ভাঙিয়া মধুর চাক।
পুণ্য-ভানুর আলো-চন্দন
ললাটে তোমার আঁকা,
বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
কল্পতরুর শাখা।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

## নববর্ষ

কি ঘোর ভীষণ দৃশ্য, আঁধারে নিমগ্ন বিশ্ব,
অনন্ত অসীম সিন্ধু সম্মুখে পশ্চাতে!
সফেন তরঙ্গরাশি লুণ্ঠিয়া পড়িছে আসি'
অনন্তের পদমূলে ত্রিমুখীর স্রোতে!
মন্থি' এ তরঙ্গগুলি বাধা-বিঘ্ন দূরে ঠেলি'
এলে তুমি ওহে পান্থ এ নব প্রভাতে!

এক-মনে এক-প্রাণে কর কর্ম্ম প্রাণপণে,
যুঝিয়া ভীষণ বলে অদৃষ্টের সাথে !

ওহে পান্থ !—
অতীতের সুখ-দুঃখ ভুলে যাও তুমি,
ওই যে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সম্মুখে রয়েছে পড়ে
তোমার সে কর্ম্মক্ষেত্র মহা-রঙ্গ-ভূমি !
ওই ক্ষুদ্র জলবিন্দু, অথবা অসীম সিন্ধু,
কর্ম্মহীন নহে কেহ, কর্ম্মময় সবে !
জগৎ উন্নতি-পথে ছুটেছে কালের রথে,
বিবর্ত্তন-চক্র সদা ঘুরিছে নীরবে !

ঊর্দ্ধে শমনের ডঙ্কা, নিম্নে পতনের শঙ্কা,
কি ঘোর সঙ্কট, ভীত বিশ্ব-চরাচর !
সে ঘূর্ণিত চক্রতলে নিষ্পেষিত পলে পলে
চেতন উদ্ভিদ কিংবা জড় ও অজড়।
এ হেন সঙ্কট-কালে কে জানে কি আছে ভালে,
সুদৃঢ় নিয়তি-তন্ত্রে বাঁধা নিরন্তর।
বুঝি না বিধির মর্ম্ম শুধু করিতেছি কর্ম্ম
কর্ম্মময় আমি, তিনি কর্ম্মের ঈশ্বর।

—কায়কোবাদ

## ভারতের সমৃদ্ধি

মোদের ভারতভূমি লক্ষ্মীর আবাস।
কত শস্য জন্মে হেথা বিহনে প্রয়াস ॥
রসাল রসাল ফল কিবা তুল্য তার।
সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তা'র তার ॥
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
অপূর্ব্ব সলিলে পূর্ণ তাহার উদর ॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ?
পানমাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর ॥
কিবা শস্য সুমধুর, আস্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশ ॥
আর এক ফল আছে নাম আনারস।
নন্দন-কানন থেকে বুঝি আনা রস ॥

ঢাকা-কাশ্মীরের তন্ত্রে কি শিল্প-চাতুরী।
অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি ॥

এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তূরী, মৃগমদ।
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিশদ ॥

এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল।
জয়িত্রী, কর্পূর, চূয়া, পূগ আদি ফল ॥

এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এদেশে।
পূর্ব্ব-পয়োধির দ্বীপ-মালায় বিশেষে ॥

সেই-সব অপূর্ব্ব সুগন্ধ দ্রব্যচয়।
ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয় ॥
ভারতে না জন্মে যাহা না জন্মে জগতে।
জগতে সর্ব্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে ॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

---

## ভারতের তপোবন

ভারতের পুণ্যাশ্রম—মহাতীর্থ সব,
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস
সংসার-সমুদ্রে তীর ; আকাঙ্ক্ষা-লহরী—
অনন্ত অসংখ্য—নাহি প্রবেশে হেথায়।

নাহি ফলে হেথা কভু সুখ-দুঃখ-ফল
বিষয়-বাসনা-বৃক্ষে ; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টকবৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখে দুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দাহন।
ভারতের তপোবন—পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি ; কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে ; জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা-আঁধারে। নীরব, নির্জ্জন
এই তপোবন হ'তে যখন যে জ্যোতি
দিব্য হয় বিনির্গত, সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,—
যে যে মহামন্ত্রবলে হতেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ,—সকলি সকলি
নীরব নির্জ্জন এই আশ্রম-প্রসূত।
ভারত—সমাজদেহ ; আশ্রমনিচয়—
তাহার হৃদয়যন্ত্র ; মস্তক তাহার—
মহর্ষি ব্যাসের এই পবিত্র আশ্রম।

—নবীনচন্দ্র সেন

## স্বদেশ-স্তোত্র

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসাবে নেত্র
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।
প্রভাতে অরুণছটা, সায়াহ্ন-অম্বরে
সুরঞ্জিত মেঘমালা কান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাখা নীলাম্বর
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন!
কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্তকরে শোভারাশি তার?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধবরণ,
চুম্বি' কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

## সর্ব্ব-তীর্থ-সার

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুখে;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া;
করিলাম পুণ্যস্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি' ভৈরবে বেড়িয়া
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল-আশ্রমে
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর-গুঞ্জমালা।
—তবু ভরিল না চিত্ত। সর্ব্বতীর্থ-সার,
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

---

# পল্লীরাণী

জড়ানো শ্যাম শ্যাম-লতাতে নদীতীরের গুল্মগুলি,
স্বচ্ছ তরল মুকুর পানে হর্ষে চেয়ে উঠ্‌ছে ছুলি' ;
ওই যেথা ওই শশক চরে শঙ্কাবিহীন হৃষ্টমনে,
মিশ্‌ছে নদীর কলধ্বনি মৌমাছিদের গুঞ্জরণে ;
ঝরা পাতার আসন পাতা, গাছটি ভরা মল্লিকাতে,
আস্‌ছে ভেসে ফুলের পরাগ শীতল শীকর-সিক্ত-বাতে,
প্রকৃতির ওই নর্ম্ম-গৃহে, শোভার প্রমোদ-ভবন-মাঝে,
মোদের রাণীর মৌন মুখর মধুর বীণা নিত্য বাজে !

ওই যে বিশাল হর্ম্ম্য ভাঙা, জঙ্গলেতে পূর্ণ বাড়ী,
চঞ্চলা তাঁর পেচক রাখি' অনেক দিবস গেছেন ছাড়ি' ;
পড়্‌ছে ঝরি' চূনবালি সব, জীর্ণ কবাট বন্ধ থাকে,
ভগ্ন পূজার আঙ্গিনাতে দিন দুপুরেই শৃগাল ডাকে ;
রুগ্‌ণ বালক-পৌত্র ল'য়ে হেথায় থাকে একলা বুড়ী,
করবীর ওই ক্ষীণ শাখাতে একটি হের ফুলের কুঁড়ি ;
অতীত সুখের পাষাণ-লিপি ধরার মাঝে বড়ই দীনা,
ওই বাড়ীতে মোদের রাণীর বাজে করুণ মধুর বীণা !
শষ্পশ্যামল মাঠের মাঝে ওই দেখ ওই অশথ-ছায়ে
পল্লীবাসীর ভক্ত রাখাল কতই গীতি নিত্য গাহে ।—
কোন্ যুগে কোন্ অতীত দিনে মাঠে গেল ফসল মারা,
পঙ্গপালে শস্য-সকল ক'রেই গেল ছন্নছাড়া !

কোন্ যুগে কোন্ জমিদারের মারা গেছে তনয় বুঝি,
রাখালগণের কণ্ঠগীতি আজো তারে বেড়ায় খুঁজি'।
অতীত দিনের ক্ষুদ্র কথা, দুঃখ সুখ ও কান্না হাসি,
মোদের রাণীর মৌন মুখের বীণার স্বরে উঠ্ছে ভাসি'!

ঠেলে রেখে কাজের বোঝা, বন্ধ ক'রে বইয়ের পাতা
মায়ের বিজন মন্দিরেতে এসো তোমায় ডাক্ছি ভ্রাতা!
আজকে শ্যামল মাঠ যে আলো বেগুনী ওই 'মস্‌নে-ফুলে',
মেঠো ঝিঙার সতেজ লতা পড়্ছে ঝুলে নদীর কূলে;
বেগুন-ক্ষেতের কুটীর হ'তে মিঠা মেঠো আস্‌ছে গীতি,
নূতন আমের মঞ্জরীতে আন্‌ছে টেনে সুদূর স্মৃতি।
পল্লীরাণীর শান্ত গৃহে পল্লীরাণীর স্নিগ্ধ ছবি
দেখ্তে সবায় ডাক্ছি আমি,—এসো ভাবুক—
ভক্ত—কবি!

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

# বাংলা ভাষা

মোদের গরব, মোদের আশা।
আ-মরি বাংলা ভাষা!
(ওগো) তোমার কোলে, তোমার বোলে,
কতই শান্তি-ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা-গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা
আন্‌ল দেশে ভক্তিধারা,
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা!
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,—
ঐ ভাষারই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আন্‌ল মালা জগৎ জিনে,
তোমার চরণ-তীর্থে, মাগো, জগৎ করে যাওয়া-আসা।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাক্‌নু মায়ে মা-মা ব'লে,—
ঐ ভাষাতেই বলব 'হরি', সাঙ্গ হ'লে কাঁদা-হাসা।

—অতুলপ্রসাদ সেন

# বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা' সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি',
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি' কায়-মন
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি'—
কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা। মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি' ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।

—মধুসূদন দত্ত

---

# মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

জান না কি, জীব, তুমি,　　জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ?
থাকিয়া মায়ের কোলে,　　সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ইন্দ্রের অমরাবতী　　ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ-সার।
শিবের কৈলাস-ধাম　　শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম,　　স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর ;
সুধাকরে কত সুধা,　　দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃভাব ভাবি' মনে,　　দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি'　　দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
দেশের আচার-মতে　　চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান-আলোচন ;
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা,　　পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

## স্বাধীনতা

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ॥
কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় ॥
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
　　　　　　　　　　বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
　　　　　　　　　　দেশের উদ্ধার॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
　　　　　　　　　　চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
　　　　　　　　　　তুল্য তার নাই॥

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

---

## কাণ্ডারী হুঁসিয়ার

দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু দুস্তর-পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান—হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ!
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?—ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

গিরি-সঙ্কটে ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
ক'রে হানাহানি, তবু চল টানি', নিয়াছ যে মহাভার!

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁসিয়ার।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

# বন্দে মাতরম্

ঘন-তমসায় অঘোরে ঘুমায় তামসিক জনগণ,
অসুর-শাসনে পশুর মতন অজ্ঞান অচেতন।
এমন সময় ঘুম-ভাঙা ডাক—
শোনা গেল দূরে ; সবে হতবাক্,
বাতাসে ও ধ্বনি ওঠে রণি' রণি'—মন্ত্র সে মনোরম,
আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে শোনে, "বন্দে মা-ত-রম্!"

আলসে, বিলাসে, আরামে-বিরামে কেটে যায় দিনরাত,
এখনো নয়নে বিজড়িত ঘুম—ডাকিল কে দৈবাৎ ?
ওগো জাগো জাগো, যে আছ মানুষ,
সুখ-শয্যায় রয়েছ বেহুঁস,—
নিজ দেশে মিছে পরবাসী হ'য়ে হারায়ো না সম্ভ্রম ;—
বন্দিনী মায়ে বন্দনা করো, "বন্দে মা-ত-রম্!"

মায়েরা মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা নিল সন্তানদল,
নব-গঙ্গার জোয়ার ছুটিল এলো বন্যার জল।
সেই বন্যায় ভেসে চলে সব,
এলো জাগরণ, এলো বিপ্লব,
শাসনের নামে শোষণে লুটিছে পরদেশী হরদম,
সহিব না আর, বল বারবার, "বন্দে মা-ত-রম্!"

শিশু বা কিশোর না করিল আর রক্ত আঁখির ভয়,
কত নর-নারী এলো ঘর ছাড়ি' গাহি' জননীর জয়।
আমাদের দেশ মোরা ফিরে চাই ;
শুনিব না আর কোনো ছলনাই,
ছদ্মবেশী ও অভিভাবকের নাহি মানি বিক্রম,
তাড়াব তাদের সাগরের পারে,—"বন্দে মা-ত-রম্ !"

টনক নড়িল বিদেশী প্রভুর হেরিল সর্ব্বনাশ,
পীড়নে পীড়নে তাই ক্ষণে ক্ষণে ভারতে জাগালো ত্রাস।
পূর্ণ হইল কত কারাগার,
দ্বীপান্তরের ভরিল আগার,
হাসি' দিল প্রাণ ফাঁসির মঞ্চে কত পুরুষোত্তম ;
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিয়া উঠিল,—"বন্দে মা-ত-রম্ !"

আজি এ ভারত করেছে স্বাধীন সেই সে মন্ত্র-বল,
সেই মহানাদ, সে মহামন্ত্র কে করিবে নিষ্ফল ?
ঋষির ধ্যানের মূর্ত্ত প্রকাশ—
সে মন্ত্র আজ কে ভুলিতে চাস্ ?
শাশ্বত হয়ে রহে যুগে যুগে যাহা 'শিব-সত্যম্' ;
এসো এক সাথে মিলাই কণ্ঠ—"বন্দে মা-ত-রম্ !"

—সুনির্ম্মল বসু

---

## জন্মভূমি

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা-হারে
 দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর,
সেইরূপ সমুদয় মেদিনী-মাঝারে
 আছে দিব্য স্থান এক অতি মনোহর !
অন্য ভূপ, লোলুপ সে দেশ-অধিকারে,
 বিপুল বিক্রমে যদি করে আক্রমণ,
হেন কাপুরুষ নাহি, অবাধে তাহারে
 প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ।
বদ্ধপরিকর সবে যুদ্ধ-ভূমে ধায়,
 গৃহ-সুখ-অভিলাষ দিয়া বিসর্জ্জন,
জনম সফল ভাবি' লয় সে বিদায়,
 প্রিয় দেশ-রক্ষা-দায় যাহার নিধন।
অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ-রক্ষণে
 অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র-অলঙ্কার ;
সুকেশিনী শিরঃ-শোভা কেশের ছেদনে
 ক্ষুব্ধা নহে, যদি তাহে হয় উপকার।
ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম !
 যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে ;—
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" যে ভূমির নাম
 উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে !

—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

---

## নীলগিরি

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে—
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে।
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায় ;
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়।
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে অরোহিয়া
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া।
ঝরঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল—
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল।
পর্ব্বতের নিকটেতে ঘুরিয়া বেড়াই ;
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই।
কত শত লতা, বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন,
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি-বন্ধন।

ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে,
নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে।
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা ;
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা।
রজনীতে কত লতা ধগ্‌ধগি জ্বলে ;
গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে।
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে ;
তার ধারে ব'সে প্রভু সন্ধ্যা-পূজা করে।

—গোবিন্দদাস কর্ম্মকার

---

## সন্ধ্যা

ডুবেছে রবির কায়া, দিবা হ'ল অবসান,
পড়েছে প্রশান্ত ছায়া জুড়াতে জগৎ-প্রাণ,
চারিদিক্ সুশীতল,
নিবে গেছে কোলাহল,
কিবা এক পরিমল ভাসিয়া বেড়ায় !
এলিয়ে পড়েছে ভব,
এলিয়ে পড়েছে সব,
আলুথালু হ'য়ে ধরা তিমিরে করিছে স্নান।

গঙ্গার স্নেহের কোলে
সমীরণ ঘুমে ঢোলে,
স্বপনে সাঁজের তারা মেলিছে নয়ান।
তীর-ভূমে তরুগণে
বসিয়াছে যোগাসনে,
কে তুমি প্রাণের প্রাণে তুলেছ পূরবী-তান!

ঢলিয়া পড়িছে মন,
দূর্ব্বাদলে যোগাসন,
কি যেন স্বপন দেখি মুদিয়া নয়ন!
নাবিকেরা খুলে প্রাণ
দূরেতে ধরেছে গান,
কি সুধা করিছে পান ঘুমন্ত শ্রবণ!

টুপ্ টুপ্ শব্দ জলে,
আসিতেছে পলে পলে,
কি জানি কি কথা বলে বুঝা নাহি যায়;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ছেলে
কেন বাছা হেসে ফেলে,
শুনিতে সে স্বর্গ-কথা সদা প্রাণ চায়।

নিথর সলিল 'পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী,
দু-পাখা ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে;

নৌকায় প্রদীপ জ্বলে,
তারকা ফুটেছে জলে,
জল-তলে ঝল্‌মলে মশাল সহাসে !

দু-পার জুড়িয়া সেতু,
যেন প'ড়ে ধূমকেতু,
যেন শুয়ে আছে কোন দৈত্য দুরাশয়,
লাল লাল চক্ষু মেলি'
নিদ্রা মৃত্যু অবহেলি'
আক্রোশে শ্মশান-পানে তাকাইয়া রয় !

উঠিল কাঁসর-রোল,
শঙ্খ-ঘণ্টা উতরোল,
আরতি-প্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে ঘাটে ;
আর্দ্র হ'য়ে ভক্তি-ভরে
'মা—মা' শব্দ করে,
আনন্দের কোলাহলে দিক্ যেন ফাটে !

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই !
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হারায়ে আঁধারে,
করিয়া জ্ঞানীর ভান,
পুষি বুকে অভিমান,
ঘোর পৌত্তলিক—সদা পূজি আপনারে !

নগরীর মনোরথ
পূর্ণ করি' রাজপথ,
হাসিয়া উঠিল কিবা প্রসারিয়া কায়া !
সুন্দরী আলোকমালা
সারি দিয়ে করে খেলা,
বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ছায়া।

আর তো লাগে না ভাল,
কে তোরা জ্বালালি আলো !
কোথায় হারাল বল ঘুমন্ত হৃদয় !
চাহিতে আকাশ-পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয় !

উদয় না হ'তে হায়,
শশিকলা অস্ত যায়,
মুমূর্ষুর প্রাণ যেন ঝিক্‌ঝিক্ করে।
বিষণ্ণ শ্মশান-ভূমি,
ঘুমায়ে রয়েছ তুমি !
কার ওই চিতানল ভস্মের ভিতরে !

প্রতিদিন কোলাহল,
প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয় !

এই যে অসংখ্য তারা
অজর অমর পারা,
এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয় ?
অনন্ত কালের সিন্ধু,
বিশ্ব বুদবুদের বিন্দু,
এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার ;
এসেছি বা কোথা হ'তে,
ফিরে যাব কি জগতে,
কিছুই জানি না ঠিক ঠিকানা তাহার !
বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
চঞ্চল চাতক-দল,
উড়ে উড়ে অন্ধকারে করে কলগান !
আমি কেন এইখানে,
চাহিয়া শ্মশান-পানে,
কিছুতেই নাহি পারি ফিরাতে নয়ান !
ও কে গো কাতর স্বরে
আন্‌-মনে গান করে,
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী-পানে !
ওরো কি আমারি মত,
হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত !
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগানে ?

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

---

# সমুদ্র

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু ; সুনীল সলিলরাশি
রবির সুবর্ণ করে বিকাশি' সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেনপুষ্পমালা ঢালি'।
অনন্ত সিন্ধুর এই অনন্ত অস্ফুট গীত
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত সুখ-দুঃখ-বিজড়িত—
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর বিমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু-সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর !
খেলিছে তরঙ্গমালা—শিরে ফেন-পুষ্পরাশি—
সমুদ্র-মন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি'।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরল-হৃদয় সিন্ধু, তরঙ্গ অনন্তোচ্ছ্বাস।

—নবীনচন্দ্র সেন

---

# গঙ্গার প্রতি

সঞ্জীবিয়া উভতীর, সঞ্চারিয়া শ্যাম-শস্য-হাসি,
তরঙ্গে সঙ্গীত তুলি' ছড়াইছ ফেন-পুষ্প-রাশি,
অয়ি সুরধুনী-ধারা ! অমোঘ তোমার আশীর্ব্বাদ !
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল-বিষ্ণুর-প্রসাদ !

রিক্ত ছিল মহী, তারে তব বর করিল উর্ব্বর,
কৃতজ্ঞ মানব তাই কীর্ত্তি তোর গাহে নিরন্তর,
যুগে যুগে ওঠে তাই তোরে ঘিরি' বেদ মন্ত্র-গাথা,
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-ধারা ! সর্ব্বতীর্থময়ী তুমি মাতা !

তোরে ঘিরি' উর্ব্বরতা, তোরে ঘিরি' স্তব-উপাসনা,
তোরে ঘিরি' চিতানল উদ্ধারের শ্বসিছে কামনা—
তীরে তীরে প্রেতভূমে ; অয়ি রুদ্র-জটা-নিবাসিনী !
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিব- নাশিনী ।

অমল পরশ তোর, বড় স্নিগ্ধ মা গো তোর কোল,
অন্তকালে ক্লান্ত ভালে বুলাও গো অমৃত-হিল্লোল ।
কত জননীর নিধি সঞ্চিত রয়েছে ওই বুকে ;
তোরে সঁপি পুত্র-কন্যা, তোরি কোলে ঘুমাইবে সুখে

একদিন তারা সবে ; দেহভার বহে প্রতীক্ষায় ;
আত্মার মিলন স্বর্গে, তোর জলে কায়ে মিলে কায়—

ভস্ম মিলে ভস্ম সনে—এ মিলন প্রত্যক্ষ সাকার !
যুগে যুগে আমাদের মিলনের তুমি মা আধার !
পর্ব্ব রচি' তাই মোরা তোরি তীরে মিলি বারম্বার,
পরশি তোমারে—অয়ি পিতৃ-পুরুষের-ভস্মাধার !
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গা ভাগীরথী ! ভারতের অন্ত, মধ্য, আদি !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

## শরতের বোধন

বর্ষারে বিদায় দিয়ে শূন্যচিত্ত উদাস আকাশ
ধরি' অভিনব মূর্ত্তি, নবনীল পরি' বেশবাস
আহ্বানিল কারে !
দিগ্‌বধূরা মুছি' আঁখি, নীলাম্বরে তনু ঢাকি',
নমিল তাঁহারে।
উদিলা শরৎ-লক্ষ্মী আপনার প্রফুল্ল প্রত্যূষে
বিশ্বের দুয়ারে।

কূলগ্রাসী নদীজল নেমে গেল পাদপদ্ম চুমি' ;
ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি' দিল তাঁরে বনভূমি
হৃদয়-আসন ;

পাখীরা আবেগ-ভরে ছুটিল ঘোষণা ক'রে
শুভ আগমন ;
হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র জানাইল নত করি' শির
নীরব বোধন !

মহেন্দ্রের মায়াধনু ঝলসিল অমরা-প্রাঙ্গণে ;
লাঞ্ছিত সুধাংশু পুনঃ শোভিলেন রাজসিংহাসনে
কিরীট-কুণ্ডলে ;
জাগি' লক্ষ তারাবালা পরাইল মণিমালা
প্রকৃতি-কুন্তলে ;—
মধুর উৎসব এল শুভ শঙ্খ বাজায়ে মধুরে
গম্ভীর ভূতলে !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

---

## কবির কামনা

সবুজ বোঁটায় সব দলগুলি তুলাইব থরে থরে,
মধু-পিপাসায় রঙের নেশায় ভুলাইব মধুকরে—
সার্থক হবে ক্ষণ-সৌরভ অসীম অর্থ-ভরা,
মনোবীজরাশি ছড়াইব আমি নব-নবীনের তরে।

মাটির পৃথ্বী বিদারণ করি' শত মুখে শত রস
শিকড়ে-শাখায় শুষিয়া লইব—হোক্ তায় অপযশ!
হৃদয়ে আমার যত সাধ আছে ফুটাইব শতদলে—
জীবন-সায়রে ফুটিয়া উঠিব—অপরূপ তামরস!

আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীম রাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অ-মৃত ভাতি,
ধরার কুসুম বার-বার হাসে, বার-বার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী।

—মোহিতলাল মজুমদার

# কবি-প্রকৃতি

সদা ভাবে-ভোলা মন, কিবা পর—কি আপন,
সে চাহে না কোনোদিন কারো পরিচয় !
নাহি জানে কোনো ভেদ, নাহি তার কোনো খেদ,
প্রেম-মন্দাকিনী ধারা হৃদে সদা বয় !
তরু-লতিকার সনে কথা তা'র নিরজনে,
পুষ্পগুচ্ছ বুকে ধরে সোহাগে আদরে।
দলিতে দূর্ব্বার দল আঁখি তা'র ছলছল,
করুণার উৎস যেন উথলে অন্তরে।

চাঁদ দেখি' ভরে বুক,— মনে ভাবে চাঁদমুখ,
মেঘে এলোকেশ দেখে, চপলায় হাসি !
কুলুকুলু নদী ধায়, তারি সনে গীত গায়,
কত কথা বলে তা'রে, ফুটে ভাবরাশি !
তা'র যে প্রাণের বীণা বাজে সে বিরাম-হীনা,
শুনে কেহ, নাহি শুনে, মিশে সন্ধ্যাকাশে !
সে কোন্ আরাধ্যা লাগি' সারা নিশি রহে জাগি'
যদি তার শুভ-স্পর্শ একবার আসে।

হোক সে-ধরার প্রাণী, নাহি তা'র জানাজানি,
অতি তুচ্ছ তা'র কাছে স্তুতি নিন্দা যশ,
গর্ব্ব তা'র—দীনতায়, ঘৃণা তা'র—হীনতায়,
বসুধা কুটুম্ব তা'র, সর্ব্বভূত বশ।

—গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

## সবারে বাস্ রে ভাল

সবারে বাস্ রে ভাল,
নইলে মনের কালো ঘুচ্‌বে না রে
আছে তোর যাহা ভাল,
ফুলের মত দে সবারে।
করি' তুই আপন আপন,
হারালি যা ছিল আপন ;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।

যারে তুই ভাবিস্ ফণী
তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী
—ভবের বনে ভয় বা কারে!

সবাই যে তোর মায়ের ছেলে ;
রাখ্‌বি কারে, কারে ফেলে ?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে !

—অতুলপ্রসাদ সেন

---

## কালোর আলো

কালোর বিভায় পূর্ণ ভুবন ; কালোরে কে করিস ঘৃণা ?
আকাশ-ভরা আলো বিফল কালো আঁখির আলো বিনা।
কালো ফণীর মাথায় মণি সোনার আধার আঁধার খনি ;
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা,—
কালোর গানে পুলক আনে, অসাড় বনে বয় দখিনা ॥

কালো-মেঘের বৃষ্টি-ধারা—তৃপ্তি সে দেয়, তৃষ্ণা হরে,
কোমল হীরার কমল ফোটে কালো নিশির শ্যাম-সায়রে।
কালো অলির পরশ পেলে তবে মুকুল পাপ্‌ড়ি মেলে,—
তবে সে ফুল হয়গো সফল রোমাঞ্চিত বৃন্ত 'পরে ;
কালো-মেঘের বাহুর তটে ইন্দ্রধনু বিরাজ করে ॥

সন্ন্যাসী শিব শ্মশান-বাসী,—সংসারী সে কালোর প্রেমে ;
কালো-মেয়ের কটাক্ষেরই ভয়ে অসুর আছে থেমে।

দৃপ্ত বলীর শীর্ষ 'পরে কালোর চরণ বিরাজ করে,
পুণ্যধারা গঙ্গা হ'ল সেও ত' কালোর চরণ ঘেমে ;
দূর্বাদলশ্যামের রূপে রূপের বাজার গেছে নেমে ॥

* * * *

কালো ব্যাসের কৃপায় আজও বেঁচে আছে বেদের বাণী,
দ্বৈপায়ন—সেই কৃষ্ণকবি—শ্রেষ্ঠ কবি তারেই মানি ;
কালো বামুন চাণক্যেরে আঁটবে কে কূটনীতির ফেরে ?
কালো অশোক জগৎ-প্রিয়—রাজার সেরা তাঁরে জানি ;
হাবসী কালো লোকমানেরে মানে আরব আর ইরাণী ॥

কালোজামের মতন মিঠে—কালোর দেশ এই জম্বুদ্বীপে,
কালোর আলো জ্বলছে আজও, আজও প্রদীপ যায়নি নিভে ;
কালো চোখের গভীর দৃষ্টি কল্যাণেরই কর্‌ছে সৃষ্টি,
বিশ্ব-ললাট দীপ্ত কালো রিষ্টিনাশা হোমের টিপে,
রক্ত-চোখের ঠাণ্ডা কাজল তৈরী সে এই ম্লান প্রদীপে ॥

কালোর আলোর নেই তুলনা,—কালোরে কে করিস্ ঘৃণা ?
গগন-ভরা তারার মীনা বিফল চোখের তারা বিনা ।
কালো মেঘে জাগায় কেকা, চাঁদের বুকেও কৃষ্ণলেখা—
বাসন্তী রং নয় সে পাখীর বসন্তের যে বাজায় বীণা,
—কালোর গানে জীবন আনে, নিথর বনে বয় দখিনা ॥

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

# মানব

নমি তোমা, নরদেব ! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি !
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি ।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ কলস
ঝলসে কিরণে,
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে ।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় ;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম-ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় !

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ !
নমি কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার,
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহে অদ্রিভার ।
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়,
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয় ।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

## মানব-প্রীতি



মানুষ আমার, ভাই, বড় প্রিয়ধন ;
মানুষ-মঙ্গল সদা করি আকিঞ্চন।
জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে, বেড়েছি মানুষ-সঙ্গে,
মানুষের সুমুখেই হইবে মরণ।
মানুষেরি খাই পরি, মানুষেরি কর্ম্ম করি,
মানুষেরি তরে ধ'রে রয়েছি জীবন।
মানুষের ব্যবহারে জ্বালায়েছে বারে বারে,
চোটে গিয়ে নির্জ্জনেতে করেছি গমন ;
সেখানে প্রকৃতি এসে' সুমুখে দাঁড়ায়ে হেসে'
প্রেমভরে দিয়েছেন গাঢ় আলিঙ্গন।
তাঁর প্রেমে মগ্ন হ'য়ে, দ্রবীভূত প্রায় র'য়ে
করি বটে কিছুদিন সময় যাপন ;
পরে ভাল নাহি লাগে, কেবলই মনে জাগে—
প্রিয়তম মানুষের মোহন আনন।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

# মহাভিনিষ্ক্রমণ

অতীত নিশার্দ্ধ ; মহা-উৎসবের শেষে
পিতার চরণে বুদ্ধ হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির ;
দাঁড়ায়ে অলিন্দে দেখিলেন, দেবগণ
নীলাকাশে নতকায় পূজিছে তাঁহায়
প্রীতি-পুষ্পে, মেলি' শত তারকা-নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিষ্ক্রমণ !
পুষ্যা-নক্ষত্রের সহ মিশি' সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগ পুণ্য-প্রীতিময়,
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
কহিতেছে এক কণ্ঠে—"এই তো সময় !"
সুষুপ্ত 'ছন্দক' ভৃত্যে করি' জাগরিত,
কহিল,—"ছন্দক ! যাও, আন ত্বরা করি'
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার !
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ !"
স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,
বিস্ময়ে ছন্দক কহে—"কহ যুবরাজ !
কোথায় যাইবে এই নিশীথ-সময়ে ?"
"ছন্দক !" সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে—

"আজনম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার,
জুড়াইতে মানবের, জুড়াতে আমার
জরা-মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি, করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন।"
এইবার স্বপ্ন নহে, পড়িল জাগ্রতে
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে—
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ! এই দেহ মৃণাল-কোমল,—
এ কি যোগ্য তপস্যার? শিরীষ-কুসুম
সহিবে কি দাবানল? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা; হায়, আশ্রিত আমরা—
কর রক্ষা আমাদের, দয়াবান্ তুমি।"
"ছন্দক!" সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
"কে সাধে এমন পত্নী প্রেম-নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণ-পুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম-ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে! ত্যজে প্রজা পুত্রোপম!
কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,
অনন্ত মানব-জাতি জন্ম-জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর

কেমনে সহিবে বল ? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার-পথ, পুড়াব স্বজন
জ্বালি' বিলাসের বহ্নি—এ ত নহে প্রেম ?
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ !
না ছন্দক ! ত্যজি' গৃহ যাব তপস্যায় ।"
"ছন্দক ! ছন্দক !" যুবা কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব,
চঞ্চল চপলা-মত, রিক্তমুষ্টি সম
অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্‌বুদের মত,
দুর্ভোগ্য স্বপনসম, দুস্পৃশ্য সফণ
সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে ।
কে বল কখন, কাম্য বস্তু উপভোগে
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
পাইয়াছে এ জগতে ? হায় ! এ সম্ভোগ
মৃগতৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি !
কই তৃপ্তি কোথা ? ভোগ-পুষ্পে-পুষ্পে—
মত্ত মধুকর-মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া
অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া
এসেছি কি ধরাতলে ? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি ? নাহি সুখ ? মানব-জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার ?

না ছন্দক ;—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,
ভোগ-দাবানল হ'তে হইতে উদ্ধার,
জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হায়, আছে মুক্তি-পথ !
খুঁজিব সে মুক্তিপথ, খুঁজিব নির্ব্বাণ,
এই দাবাগ্নির ধারা করিব শীতল !
আন অশ্ব ! হও তুমি সহায় আমার !
উড়িবে যে পাখী ঐ অনন্ত আকাশে,
সোনার পিঞ্জরে তার, সোনার শৃঙ্খলে—
মিটিবে কি সাধ ? দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া !”
ছন্দক কাঁদিয়া কহে—“হায় ! দেব ! তবে
নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি ?”

“নিশ্চয় ছন্দক ।”—
উত্তরিলা দৃঢ় কণ্ঠে কুমার—“নিশ্চয় !
সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার ।
মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত-লৌহ পথে
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন ।
শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা,
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া-বলে

করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক ! প্লাবিত
করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকারে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা আমি পালিব নিশ্চয় !"
আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক !

পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
দেখিতে গোপার, নব প্রসূনের মুখ !
সূতিকা-আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদুমন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ ! কুসুম-শয্যায়
আলুলায়িত-কুন্তলা, স্খলিত-বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্য শিশু,
সোনার প্রতিমা-বক্ষে সোনার কুসুম—
লইয়া আদরে যেন ;—জিনি' দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুইজন !
এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর ;
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দু'নয়নে
আসিল, ভাসিল ধীরে, মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার !

—নবীনচন্দ্র সেন

———

## কি চাই

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ,
মুকুতা মাণিক নিধি
আমারে দিওনা বিধি !
চাহিনা এ জগতের রাজত্ব-সম্মান ;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে,
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে'
মেগে নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান।
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ !

আমি চাই শিশু-হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা,
কয়না সাজানো কথা,
জানেনা যোগাতে মন করি' নানা ভান ;
প্রাণ খোলা, মন খোলা,
আপনি আপনা ভোলা,
তার স্নেহ-প্রীতি সবি হৃদয়ের টান !
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ !

আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ,
পবিত্র—ঊষার রবি,
কোমল—ফুলের ছবি,
মধুর—বসন্ত-বায়ু পাপিয়ার গান ;

আনন্দে—শারদ ইন্দু,
গাম্ভীর্য্যে—অতল সিন্ধু,
পূর্ণ—বরষার বিল ভরা কানেকান !
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ !

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে তোষামোদ
নীচতার অনুরোধ,
তার ব্রত—সত্যরক্ষা, সত্যানুসন্ধান ;
চাহেনা নিজের ইষ্ট,
অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পমান ;
জীবন-সংগ্রামে নিত্য
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান !
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ !

আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ,
ছিঁড়িয়াছে মোহপাশ,
ছয় রিপু চির দাস,
নরনারী ভাই বোন, নাহি অন্যজ্ঞান ;

চাহিতে মুখের পানে
সঙ্কোচ আসে না প্রাণে,
কি যেন দেবত্ব-মাখা সে পূত বয়ান !
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ !

আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ,
পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে
চির আত্ম-বিসর্জ্জন চির আত্মদান !
ব্যথিতে পড়িলে মনে
ধারা বয় দুনয়নে,
হৃদিতলে সদা চলে প্রেমের তুফান !
সে নয় স্বতন্ত্র কেহ
বিশ্বই তাহার গেহ,
সে সাধে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ !
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ !

আমি চাই বিশ্বোদার উদার পরাণ,
অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগৎ-ভরা এক ভগবান ;

জ্ঞান সত্য নীতি পূজে,
দলাদলি নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়ের সন্তান !
মরমে মহত্ত্বপূর্ণ,
হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান ;
ন্যায়-তরে প্রিয়ত্যাগী,
প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী-গুণীর সম্মান ;
অনুতপ্ত-অশ্রুধার
কখনো সহেনা তার,
অনুতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান ;
বিশ্বের উন্নতি-আশা,
বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি' আত্মদান,
মরতে সে দেবোপম
উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থা তারে কোলে দিয়ে স্থান,
আমি সাধি সাধনা সে দেবতার প্রাণ !

—মানকুমারী বসু

---

## সোজা হ'য়ে দাঁড়া

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে ?
মাথা উঁচু রাখিস্।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধ'রে থাকিস্।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,
ঊর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস্।
চোখের জলে ভিজে আওয়াজ কেউ যেন না শোনে,
মাকে যখন ডাকিস্।
তাঁরই-দেওয়া অন্ধকারের গাঢ়তম কোণে
মুখখানি তোর ঢাকিস্।
আধি-ব্যাধির ধান-দূর্ব্বা পূর্ণ আশীর্ব্বাদে
মাথায় ঝ'রে পড়ুক।

বাসা-ভাঙা সুখের আশা জীর্ণ জরার সাথে
স্তব্ধ হ'য়ে মরুক্।
কোথায় তুমি তথাগত ব্যাধি জরা-জয়ী ?
দাঁড়াও এসে কাছে !
নিত্য উৎসরিত তোমার আলোর ঝরা কই
অন্ধকূপের মাঝে ?
ভগ্নস্তূপের জীর্ণ মঞ্চের সুপ্ত ছায়া জুড়ে'
মৃত্যু বাসা বাঁধে।
অমানিশার রুদ্ধ-কারায় ক্ষুব্ধ বায়ু ঘুরে'
নিঃশ্বসিয়ে কাঁদে।
বিশ্বপটের চারুদৃশ্য মুছে গেল ব'লে
বুক যেন না দমে।
নির্ভয়ে তুই রাখ্‌রে মাথা কালরাত্রির কোলে !
কর্‌বে কিবা যমে ?
থাক্‌বে দুঃখ দৈন্য জরা শুকিয়ে ঘাটে পাড়ে,
তুচ্ছ করিস্ তাকে।
ঐ শোন্ রে বাজিয়ে বাঁশী নদীর পরপারে
কে যেন রে ডাকে।
সুর বেঁধে নে ওরে আতুর, পরপারের গাথার
মধু-ঝরা সুরে !
ক্লান্তি-ভরা শান্তি-হরা গুরু বোঝা মাথার
ফেলে দিয়ে দূরে,

গাও রে প্রীতির নবগীতি! মৃত্যু মরুক কেঁদে—
কেউ পাবে না সাড়া।
যাক না ডুবে রূপের জগৎ! নূতন বিশ্ব বেঁধে
সোজা হয়ে দাঁড়া!

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

---

## সঙ্কল্প

স্বার্থ অসির ঘাত-প্রতিঘাত
দুঃখ-সুখে টল্‌ব না,
তোষামোদের নিশান হাতে
আপ্‌নারে আর ছল্‌বনা;
স-পৌরুষে দল্‌ব পদে
পরাজয়ের কল্পনা—
মঠে মঠে লুটিয়ে মাথা
নয়ন-জলে গল্‌ব না।
বিবেক বারণ শুন্‌ব শুধু,
গুরুর নিষেধ মান্‌ব না,
জীবন্মৃতের মন্ত্রে ভুলে'
কে রবে আর আন্‌মনা?
সত্য-ন্যায়ের শাস্ত্র ছাড়া
অন্য বিধান জান্‌ব না—

আকাশ-কুসুম লক্ষ্য ক'রে
বাণের ফলা হান্‌ব না।
অভিমানীর সোনার প্রদীপ
পূজার ঘরে জ্বাল্‌ব না,
রজস্তম ধূপ ধূনা ছাই
কাজল-কালী ঢাল্‌ব না।
বলের সেরা ধ্যানের বলে
অকুতোভয় দৃক্‌পাতে
ভর্‌ব আমার ধর্মশালা
অমৃত-রস-ভিক্ষাতে।

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

---

# দূর-যাত্রী

ঝড়ের হাওয়ায় মুখে এসে লাগে
ঢেউয়ের ছিটে,
মুখে এসে লাগে কণা-কণা ফেনা
নোন্‌তা-মিঠে।
উতল উছল উথলেছে জল
উড়্‌ছে ঝড় ;
আজ আমাদের নৌকায় ভাই
নাই নোঙর।
সার বেঁধে বসে দাঁড় তুলে নিই
উড়াই পাল,
সমুখে মোদের কূল নাই, শুধু
আগামী কাল।

সাগর-পাখীরা এলানো ডানার
হানে ঝাপট,
সাহসে বিশাল স্ফীত আমাদের
বক্ষতট।
আলোর ইশারা নাই এতটুকু
না থাক্ তারা ;
স্নায়ুতে-শিরায় শুধু যাত্রার
প্রখর সাড়া।

সার বেঁধে বসে দাঁড় টানি মোরা
উড়াই পাল,
দুই চোখে আশা, দুই বাহু ভরা
বল বিশাল।

বেগে উজ্জ্বল ছুটছে এ জল
অহর্নিশ,
ভয় করি নাকো আমরা নাবিক
ইউলিসিস্।
খুঁজি নাকো পার, বিশ্রামাগার
খুঁজি না দিক্,
শুধু যাত্রার আনন্দে মোরা
জল-পথিক।
তার তরে মোরা পাড়ি মারি ভাই
উড়াই পাল,
ঠুঁটো হাত মেলে সহজে যাহার
নাই নাগাল।
তোমাদের তরে থাকুক নিঝুম
শ্যামল মাটি,
ঠাণ্ডা দাওয়ায় বিকালে বিছানো
শীতল পটি।

বিছানায় থাক্ নরম চাদর
চাঁদের ছিটে,
ছোট ক'রে রাখো নিজের পরিধি
কাঠে ও ইঁটে।
উত্তাল ঢেউয়ে পাড়ি দিই মোরা
উড়াই পাল,
তোমাদের ঘিরে চারিদিকে থাক্
ঘন দেয়াল।

সার বেঁধে বসে দাঁড় হেনে জল
করেছি ঘোলা,
উপরে ঝড়ের নীচে সাগরের
নাগরদোলা।
জলতল হতে হাঙর কুমীর
মারছে ঘাই,
প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর সাথে
করি লড়াই।
সার বেঁধে বসে দাঁড় টানি মোরা,
উড়াই পাল,
ঢেউ-ভুজঙ্গ মার্‌ছে ছোবল
ডাকে কোটাল।

জীবনের সাধ বুঝ্‌লুম ভাই
আমরা বরং,
জলতরঙ্গে বাজাই আমরা
জলতরঙ্‌।
দূর-বিদেশের মাটির গন্ধ
লাগ্‌ছে নাকে,
কোন্‌ আকাশের ধূসর তারাটি
মোদের ডাকে।
তারি সন্ধানে পাড়ি মারি মোরা
উড়াই পাল,
দাঁড় বেয়ে মোরা বাধা-নিষেধের
ভাঙি আড়াল।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

---

## রাম গরুড়ের ছানা

রাম গরুড়ের ছানা হাস্‌তে তাদের মানা।
হাসির কথা শুন্‌লে বলে,
"হাস্‌ব না-না, না-না।"

সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে-পাশে।

ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস্‌ যদি
মার্‌ব কিন্তু তোকে!"

যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!

সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠ্‌ছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।
হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা ?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়,
নিষেধ সেথায় হাসা।

—সুকুমার রায়

---

## শরতের বাংলা

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি' গেছে খানা-ডোবাতে !
পারে না বহিতে লোকে জ্বর-ভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর ;

দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে—
একপাশে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠায়ে দিয়াছ ভুবনে।
রোগে-বন্যায় 'ভাণ্ডে ভবানী',
তোমার ভবনে ভবনে!
অবসর আর নাহিক তোমার
দলে দলে ছুটে ভলান্টিয়ার,
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত.
পান্ত আনিতে লবণে!
জননী তোমার চির-চাঁদা খাতা
খুলিয়া রেখেছে ভুবনে।

গুলি' কাদাপাঁক করেছ বেবাক
জলাশয় ঘোলা-বরণী।
পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা
বন-জঙ্গলা ধরণী।
ঘরে-দ্বারে আর ঝোপে-ঝাড়ে বনে
বাঁশি বাজে যেন সকরুণ স্বনে,

উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চোখে মুখে নাকে
মশক মশক-ঘরণী।
জলাশয়গুলা করিয়াছ ঘোলা
বনজঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে ;
কুটীরে কুটীরে নব নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা উঠে ক্রন্দন
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন
যমদূতচয় মুঠা মুঠা লয়—
পড়ে পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে।

আয় আয় আয় যে আছ যেথায়—
কাঙ্গালী ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার খুদ বাঁটিছে জননী
বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।
ওঘর হইতে আয় হামা দিয়ে,
ওবাড়ী হইতে আয় খোঁড়াইয়ে

কে কাঁদি ক্ষুধায় মায়েরে কাঁদায়
খুদ কুঁড়া খায় খুঁটিয়া ?
ভিক্ষা-অন্ন বাঁটিছে জননী,
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে কণ্টকমালা
ব্যথায় কাঁদিছে ডুকরি' ;
তালি-মারা মেঘে আকাশ-আঁচল
ছিন্ন যেন সে ধুকরি।
কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হরিণে,
কঠিন শিকল-বিকল চরণে
জননী কাঁদিছে ফুকরি'।
রোগে-বন্ধনে তাপে-ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি'।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

---

## হায়রে সেকাল

হায়রে সেকাল ! ওরে ভুঁদো, ঠাণ্ডা হ'য়ে দাঁড়া !
রাত-দিনই ছুটোছুটি—হ্যাঁরে লক্ষীছাড়া ?
এই দেখ্, পা নড়্ছে, হাত নাড়ছিস ফের ?
ঘাড় নড়্ছে ! মাথায় হাত ? পাওনি বুঝি টের—

আমি কেমন শক্ত লোক ? আমরা ছেলেবেলা
থাকতাম শুধু চুপ ক'রে—জানতাম নাকো খেলা।
ছ' বছরের ধেড়ে ছেলে—হায়রে কলিকাল !
শিখ্‌লি নাক' শিষ্টাচার—ভাল চলন-চাল ?
হায়রে সেকাল ! ওরে মোনা, ওকি পড়ছিস্ ছাই ?
একালে কি সেকেলে সব ভাল গ্রন্থ নাই ?
কোথায় গেল দাতাকর্ণ, সত্যপীরের গান !
খনার বচন শুনতে এখন পাতে না কেউ কান !
তুলোট কাগজ, খাগের কলম, উঠেই গেল যদি—
এ কালেতে বিদ্যে-সাধ্যি হবেই হবে রদি।
হায়রে সেকাল ? এখন কি কেউ আইন-কানুন জানে
বুঝলে নাক' সোনা সেদিন 'কার্যানঞ্চ' মানে।
জেলায় ছিল রাম মোক্তার, হাকিম স্বরূপ-চাষী ;—
তেমনটি আর না হবে গো ? এখন সবই ফাঁকি !
ফোড়া কাট্‌ত বাঞ্ছা-নাপিত এবং দেখ্‌ত নাড়ি ;
কেউ কখনও পড়ে নি ক'—ডাক্তারি-ফাক্তারি।
নাড়ী টিপে বলে দিত কে মর্বে কবে ;
এখনই সব উলট-পালট, তেমনটি কি হবে ?

[ সংক্ষেপিত ]

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

## ধার্ম্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি

ওহে মৃত্যু ! তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন,
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে,
চিরবাসস্থান ব'লে ভাবে মনে মনে ;
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন
করি' আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়,
প্রাণ-প্রিয়তম-প্রেমে মুগ্ধ যারা নয় ;
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটি তোমার,
তাহাদেরি হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার ?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস, সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।

যে অম্লান কুসুমের মধু-পান তরে
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে ;
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু ! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত ;
কোনরূপে তোমায় করিলে অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম !

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

---

## একই

একই ঠাঁই চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি,
জীবন—জল-বিম্ব-সম ; মরণ—হ্রদ-হৃদি ;
দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দু'দিন আগে, দু'দিন পিছে,
একই সেই সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

একই ঘোর আঁধার আছে ঘেরিয়া চারিধারে,
জ্বলিছে দীপ, নিভিছে দীপ সেই অন্ধকারে,
অসীম ঘন নীরবতায় উঠিয়া গীত থামিয়া যায়,
বিশ্ব জুড়ি' একই খেলা চলেছে নিরবধি !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

---
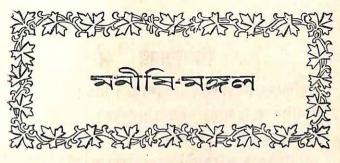
## রাজা রামমোহন রায়

হে রাজেন্দ্র ! শ্বাস-হরা তমস্বিনী ঘোরা !
একটি নক্ষত্র নাই ! আজি এই বঙ্গে,
ভেসে যাই, ভেসে যাই, ভেসে যাই মোরা
লীলাময়ী লালসার চঞ্চল তরঙ্গে !
অপাঙ্গে মাধুরী-রাশি, চাতুরী ভ্রূভঙ্গে,
আহ্বানিছে নাস্তিকতা ! সুরা রক্তাকারা
পাত্রে ঢালে মুহুর্মুহু ! হ'য়ে মাতোয়ারা
অধর্ম্ম অঘোরপন্থী নাচে, হের, রঙ্গে !

হে রাজর্ষি ! ধ্যান-বলে, নারদী-কৌশলে,
আন, আন উষারূপ অনিন্দ্য সুন্দরী
ভকতিরে ! জ্ঞানারুণ উদয়-অচলে
ছড়াক্ আলোকরাশি ! পোহাক্ শর্ব্বরী !
আর্দ্র কেশে, শুভ্র বেশে, আনন্দে ধরিয়া
হরিপাদপদ্ম, বঙ্গ উঠুক হাসিয়া।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

# বিদ্যাসাগর

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর—বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয় !
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াও নি শির জীবনে একবার !
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্যমূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার !

নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
কর্‌লে পূরণ অনাথ-আতুর-অকিঞ্চনের সাধ ;—
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি কর্‌লে বারংবার।

[ সংক্ষেপিত ]

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

---

# পরিশিষ্ট

## কবি-পরিচিতি

[ বর্ণানুক্রমিকভাবে প্রদত্ত ]

**অক্ষয়কুমার বড়াল**—( ১৮৬০—১৯১৯ )—অক্ষয়কুমার কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক বিখ্যাত গীতি-কবি। কবি বিহারী-লালের কবিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ইঁহার উপর বিহারীলালের প্রভাব সমধিক। ভাবাবেশ-বিহ্বলতায় ইনি বিহারীলালের সমধর্মী কবি। অক্ষয়কুমারের কবিতার প্রধান লক্ষণ দুইটি— ১। মিতভাষিতা এবং ভাষার বিশুদ্ধি, ২। আত্মভাবপ্রধান কল্পনা। এই মিতভাষিতার ফলে তাঁহার কবিতায় ভাবের গাঢ়তা সৃষ্টি হইয়াছে। আত্মভাবপ্রধান কল্পনার ফলে ইঁহার কবিতা মধ্যযুগীয় গীতি-কবিতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি-বর্ণনায়, মানবমহিমা-কীর্তনে এবং করুণ রস বর্ণনায় অক্ষয়কুমারের দক্ষতা ছিল।

কবির প্রথম কাব্য 'প্রদীপ'। ইহার পরে তিনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেন। 'কনকাঞ্জলি,' 'ভুল,' 'শঙ্খ,' 'এষা' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। 'এষা' কাব্যে তিনি নারীজাতির মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ওমর খৈয়ামের অনুসরণে তিনি 'পান্থ' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন।

**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**—( ১৯০৩— )—রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যে,—অতি-আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে, যে, কয়জন কবি আপন প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলিষ্ঠ

সমাজ-চেতনা, মানুষের শুচিসুন্দর জীবনের জন্য সুতীব্র আকুলতা এই কবির কবিতাকে একটা অপূর্ব বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। মানুষকে তিনি প্রাণের আবেগে জাগ্রত দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই যৌবনের আগ্নেয় দুর্দান্ততা, জীবনের দুর্বার দুরন্ত আবেগ তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার কবিতা মুক্তগতি প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত, চিরনবুজের জয়গানে মুখরিত। মানবের বৃহত্তর সত্তার আকুতি, মানুষের মুক্তির প্রতি গভীর আসক্তি তাঁহার কবিতার মৌলিক প্রেরণা বলিয়াই কবি গতিস্পন্দনবিহীন প্রাণের দুরন্ত আবেগ ও উল্লাসশূন্য জীবনকে কোনদিন মানিয়া লইতে পারেন নাই জীবনকে মহত্তর করিয়া তুলিবার জন্য মৃত্যুদীপ্ত প্রাণবন্যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ার জন্য এই কবি নিরন্তর একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছেন। 'অমাবস্যা', 'নীল আকাশ', প্রভৃতি ইঁহার কাব্যগ্রন্থ। উপন্যাস এবং ভক্তিমূলক গদ্যগ্রন্থ রচনাতেও ইনি ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। 'পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ' এবং 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' অচিন্ত্যকুমারের ভক্তিমূলক গদ্যরচনা।

**অতুলপ্রসাদ সেন**—( ১৮৭১—১৯৩৪ )—বিখ্যাত গীত-রচয়িতা কবি। ইনি ব্যারিস্টার ছিলেন। প্রথমে কলিকাতায়, পরে কিছুকাল রংপুরে ব্যারিস্টারী করিয়াছিলেন। অবশেষে লক্ষ্ণৌ নগরীতে গিয়া ব্যারিস্টারী শুরু করেন। স্বদেশ এবং মাতৃভাষার প্রশস্তিমূলক ইঁহার গানগুলি বাংলাদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে।

**ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত**—( ১৮১১—১৮৫৮ )—২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে এই কবির জন্ম হয়। ইনি মধ্যযুগের বাংলার শেষ কবি। তাঁহার রচনার কোন কোন লক্ষণে, এবং তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে, নূতন যুগের বা আধুনিক যুগের সূচনাও লক্ষ্য করা গিয়াছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, ঐতিহাসিক বিষয়, ঋতুদৃশ্য প্রভৃতি

যাহা কিছু প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব তাহার বর্ণনাতে ইনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কবি তাঁহার সমসাময়িক বাঙালী সমাজের বহু বাস্তব-চিত্র, কখনও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া, কখনও হাস্যরসমণ্ডিত করিয়া, অতিশয় সহজ ছন্দে ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। দেশপ্রীতিমূলক এবং ধর্মভাবাত্মক কবিতা রচনাতেও এই কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি 'সংবাদ প্রভাকর' নামে একখানি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং ঐ পত্রিকাখানির পরিচালনা-সূত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। এই 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় পরবর্তী যুগের কয়েকজন বিখ্যাত লেখক,—যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণের সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল।

**করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়**—(১৮৭৭—১৯৫৪)—নদীয়া জেলার শান্তিপুর নগরে এই কবির জন্ম হয়। ইঁহার কবিতায় ভাষার লাবণ্য, শব্দচয়নের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং শব্দের সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপ রঙ সুস্পষ্ট করিবার শক্তি—এই তিনটি গুণ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই কবিকে—সৌন্দর্য-তন্ময় কবি বলিতে হয়। প্রগাঢ় ঈশ্বরভক্তিও এই কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ইঁহার রচিত কাব্যের নাম—'প্রসাদী', 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা'।

**কামিনী রায়**—(১৮৬৪—১৯৩৩)—প্রসিদ্ধ স্ত্রী-কবি। বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার রচিত কাব্য-গুলির মধ্যে প্রথম কাব্য 'আলো ও ছায়া'ই সর্বোৎকৃষ্ট। কবির অপর কাব্যগুলির নাম—'নির্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি। সমাজের মুখপাত্র হিসাবে উচ্চ-কল্পনা এবং উন্নত-আদর্শের চর্চা এ কবির কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

**কায়কোবাদ**—বিখ্যাত মুসলমান কবি। ঢাকা জেলার আগলা গ্রামে ইহার বাড়ী ছিল। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম—'বিরহ-বিলাপ', 'কুসুম-কানন', 'অশ্রুমালা', 'মহাশ্মশান'।

**কুমুদরঞ্জন মল্লিক**—( ১৮৮২— )—ইহার জন্ম বর্ধমান জেলার উজানী গ্রামে। ইনি 'অজয়', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'বন-তুলসী', 'বনমল্লিকা' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। কবি হিসাবে ইনি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন—ইহার প্রাণ-মন বৈষ্ণবীয় প্রেম ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। তাঁহার সৌন্দর্য-দৃষ্টি সর্বত্র ভক্তি অথবা প্রীতির আবেগে অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। কবি বাংলার পল্লীকে তীর্থ-মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। ইহার কবিতার ভাষা ও উপমায় কবির সুগভীর ভাব ও অকপট অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে।

**কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার**—(১৮৩৮—১৯০৭)—খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে বৈদ্যবংশে ইনি জন্মগ্রহন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। পরে বয়স হইলে তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া ঐ দুই সাহিত্যের ভাব লইয়া কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। হাফিজের ঈশ্বরপ্রেমের কবিতা এবং সাদীর নীতিমূলক কবিতা কৃষ্ণচন্দ্রের মনে ঈশ্বরভক্তি ও নীতির প্রতি অনুরাগ জাগ্রত করিয়া দেয়। পারস্যের কবি হাফিজ এবং সাদীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইনি বহু কবিতা রচনা করেন এবং তাহা 'সদ্ভাব-শতক' নামে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হয়।

**গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়**—(১৮৭০—১৯৩৪)—ইনি রানাঘাটের নিকটস্থ গরিবপুরের জমিদার ছিলেন। নানা মাসিকপত্রে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'কবিতালহরী', 'পত্রপুষ্প', 'পরিমল', 'বেলা', 'অর্পণ' নামে ইঁহার কবিতাপুস্তক আছে।

**গোবিন্দদাস কর্মকার—( ষোড়শ শতক )**—বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরে কবির জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়া মহাপ্রভুর তীর্থপর্যটনের সঙ্গী হন। তিনি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস তাঁহার রচিত চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থ 'কড়চায়' লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ এই কড়চাকে জাল ও গোবিন্দদাস নামটিকেও কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। সে যাহাই হউক, গোবিন্দ-দাসের ভণিতাযুক্ত যে চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যে কবিত্ব, সুন্দর চরিত্রচিত্রণ এবং প্রকৃতিদৃশ্য-বর্ণনা আছে, উহা আমাদের সমাদর লাভের উপযুক্ত।

**দেবেন্দ্রনাথ সেন—( ১৮৫৫—১৯২০ )**—কবি খুব সম্ভবত বিহার প্রদেশের গাজীপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. এ. পাশ করেন। এই কবির প্রথম জীবন ওকালতিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। জীবনে নানা বিপর্যয় ও দুঃখদুর্দশা ইঁহাকে ভোগ করিতে হয়। ইনি 'অশোক-গুচ্ছ', 'শেফালিগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ', 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা', 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। উহাদের মধ্যে 'আশোকগুচ্ছ' কাব্যখানিই সর্বোৎকৃষ্ট।

কল্পনার ঐশ্বর্যে, শব্দ ও ভাষার লাবণ্যে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা পরিপূর্ণ। কবির ভাষা, ভাব, ছন্দ অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক। প্রকৃতির রূপ রঙ রেখাকে আশ্চর্যরূপে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার ক্ষমতা এই কবির ছিল।

**দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—( ১৮৬৩—১৯১৩ )**—বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাহ্মণকুলে এক অতি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন, এবং সেকালের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে চরিত্র

এবং বিদ্যার গুণে সম্মানিত হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অতিশয় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১১ সালে এম্. এ. পাশ করার পর ইনি স্টেট্ স্কলারশিপ লইয়া বিলাতে যান এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বশক্তি তাঁহার বাল্যকালেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ইঁহার হাসির গান এবং নাটকগুলি বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কবিতায় বিস্ময়কর মিলবিন্যাস করিবার এবং ছন্দের অপূর্ব ঝঙ্কার সৃষ্টি করিবার ইঁহার ক্ষমতা ছিল। ইঁহার স্বদেশ সম্বন্ধীয় কতকগুলি গান বহুজনসমাদৃত হইয়া আছে। কতকগুলি হাসির কবিতা ও হাসির গানও লোকমুখে প্রচলিত। 'মন্দ্র', 'আষাঢ়ে', 'আলেখ্য', 'হাসির গান' প্রভৃতি ইঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার দেশবাসীর চরিত্রকে উন্নত করিবার জন্য এবং তাহাদের মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতিগৌরব জাগ্রত করিবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে—'দুর্গাদাস', 'রাণাপ্রতাপ', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**নবীনচন্দ্র সেন**—( ১৮৪৬-১৯০৯ )—চট্টগ্রাম জেলায় এই কবির জন্ম হয়। ১৮৬৮ সালে ইনি বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই কবিতা রচনায় ইনি প্রবৃত্ত হন এবং নানা পত্র ও পত্রিকায় ইঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়। পলাশীর যুদ্ধ নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে নবীনচন্দ্র বহুবিখ্যাত হইয়া পড়েন। এই কাব্য স্বদেশপ্রেমাত্মক ও আবেগময়। অতঃপর 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস' নামে তিনখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্য তিনখানির নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। কবি তাঁহার এই কাব্যত্রয়ের শ্রীকৃষ্ণকে সর্বসংস্কারমুক্ত পুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন,—এই শ্রীকৃষ্ণ একটি নবভারত

রচনার পরিকল্পনা লইয়া তাঁহার কাব্যে আবির্ভূত। ভারতে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের তিনি প্রয়াসী।

যে সময়ে নবীনচন্দ্র তাঁহার এই কাব্যত্রয় রচনা করেন, সেই সময়ে জাতীয় জীবনের নানা বিভেদ-অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ও স্বপ্ন এদেশের জনচিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। কবি সেই সময়ে এই কাব্য তিনখানি রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া উচ্চ-নীচবর্ণভেদরহিত সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত অখণ্ড এক ভারত-রাজ্য সংগঠনের বাণী উচ্চারণ করাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেইজন্য এই কাব্যত্রয়কে "উনবিংশ শতকের মহাভারত"—এই আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র সেনের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—'অমিতাভ', 'অমৃতাভ', 'খৃষ্ট' প্রভৃতি। 'অমিতাভ' বুদ্ধের জীবনকাহিনী লইয়া রচিত কাব্য, 'অমৃতাভ' শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া রচিত কাব্য, 'খৃষ্ট' মহাত্মা যীশুর জীবনী লইয়া রচিত। কবির সকল কাব্যের মধ্যেই একটা উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কবির কাব্যসমুহের ছন্দ মধুর—গম্ভীর। মধুসূদনের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গীতধ্বনি নবীনচন্দ্রের কাব্যসমূহে অক্ষুণ্ণ হইয়া আছে।

**কাজী নজরুল ইসলাম—( ১৮৯৯- )**—বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। কালবৈশাখীর ঝড় যেমন করিয়া তাহার প্রচণ্ড প্রবল শক্তি-উন্মাদনা লইয়া আবির্ভূত হয়, যেমন করিয়া সে আপন প্রবলতায় মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে,—বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাবও অনেকটা সেইরূপ। তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও সুতীব্র উন্মাদনার সুর। কবির ঐ বিদ্রোহ হইতেছে—অন্যায়, অসত্য, অধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সেইজন্য ইনি "বিদ্রোহী কবি"—এই আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন।

কবি সাম্যবাদের পূজারী, পরাধীনতার শিকল-ভাঙার গান তিনি গাহিয়াছেন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'দোলন চাঁপা', 'ঝিঙেফুল' প্রভৃতি ইঁহার কাব্যগ্রন্থ। গান রচনাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত। ইঁহার সাম্যমৈত্রীমূলক এবং দেশ-প্রেমাত্মক গানগুলি বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইঁহার কয়েকটি ছোট গল্পের বই এবং উপন্যাস-গ্রন্থও আছে। এক সময়ে ইনি 'নবযুগ', ধূমকেতু', 'লাঙ্গল' নামে কয়েকখানি পত্রিকা-সম্পাদনও করিয়াছিলেন।

**প্রমথনাথ রায়চৌধুরী**—এই কবির স্বদেশপ্রীতিমূলক জাতীয়-সঙ্গীতগুলি বিশেষ জনপ্রিয়। ইঁহার রচিত 'পদ্মা', 'গীতিকা', 'গৈরিক', 'গৌরাঙ্গ', 'দীপালী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইঁহার কবিতার ভাব সুন্দর, ভাষা মধুর এবং ছন্দের ঝঙ্কার শ্রুতিসুখকর।

**বিজয়চন্দ্র মজুমদার**—( ১৮৬১-১৯৪২ )—ইনি একাধারে কবি, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। 'পঞ্চশর', 'যজ্ঞভস্ম', 'হেঁয়ালি', 'পঞ্চকমালা', 'বিদ্রূপ ও বিকল্প', 'গীতগোবিন্দ', 'থেরিগাথা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার কবিতার ভাব ও ভাষার বলিষ্ঠতা বিস্ময়কর।

**বিহারীলাল চক্রবর্তী**—( ১৮৩৫-১৮৯৪ )—ইঁহার 'সারদামঙ্গল' কাব্য অপূর্ব সুন্দর সুমিষ্ট গীতি কবিতা ও কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সেইজন্য ইনি 'সারদামঙ্গলের কবি' হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করিয়াছেন। ইঁহার অপর কাব্যগুলির মধ্যে 'সাধের আসন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন' প্রধান। সঙ্গীত রচনাতেও ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং বহু সঙ্গীত ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক গীতিকবিতারচনার পথপ্রদর্শক বিহারীলাল। ইঁহারই ভাব ভাষা ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গীতিকবিতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা রূপে বিকশিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে।

**মধুসূদন দত্ত—( ১৮২৪-১৮৭৩ )**—যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবির জন্ম। ১২৷১৩ বৎসর বয়সের সময়ে কলিকাতায় আসিয়া ইনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন শুরু করেন, পরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া মধুসূদন হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় হইতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ ঘটে এবং ইংরাজিতে কবিতা রচনা করিয়া ইনি কবিযশ লাভের প্রয়াসী হন। কতকগুলি ইংরাজি খণ্ড-কবিতা এবং 'ক্যাপটিভ লেডি' ও 'ভিসনস্ অব দি পাস্ট্' নামক দুইখানি ইংরাজি কাব্য মধুসূদনের প্রথম যৌবনের রচনা। বাংলা ভাষায় প্রথমে তিনি নাটক রচনা করেন। পরে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য রচনা করেন। স্বদেশের শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি ব্যারিস্টার হইবার জন্য বিলাত যান। সেই সময়ে কিছুকালের জন্য ইনি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন চতুর্দশপদী কবিতার অধিকাংশ ইনি রচনা করেন। 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণ-কুমারী নাটক' মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। তাঁহার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুইটিও কবির অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

মধুসূদন বঙ্গভাষায় নব নব সৃষ্টি করিয়া আমাদের সাহিত্যে এমন বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য আনিয়াছিলেন যাহা তাঁহার পূর্বকালবর্তী বঙ্গ-সাহিত্যে ছিল না। কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি নূতন কল্পনা, নূতন ভাষা ও নূতন ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন,—তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' বঙ্গভাষায় প্রথম মহাকাব্য। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেটের ছন্দ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। মধুসূদনের আবির্ভাবের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্য প্রধানতঃ ভারতচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। মধুসূদনের আবির্ভাবে সেই পথ পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

**মানকুমারী বসু**—ইনি বাংলার অমর কবি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বাংলার মহিলা-কবিদিগের মধ্যে ইনি একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছেন। মানকুমারীর জন্ম হয় তাহার মাতুলালয়ে,—যশোহর জেলায় শ্রীধরপুর গ্রামে। ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ—'কাব্যকুসুমাঞ্জলি'। ঐ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেই ইনি কবিখ্যাতি অর্জন করেন। পরে 'কনকাঞ্জলি', 'শুভসাধনা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেন। ইঁহার কবিতা সরল ও অনাড়ম্বর। ঈশ্বরভক্তি, সংযম ও শুচিতার ভাব মানকুমারী দেবীর কবিতার অন্যতম বিশেষত্ব।

**মোহিতলাল মজুমদার**—(১৮৮৮-১৯৫২)—পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। মাতুলালয় কাঁচড়াপাড়ায় কবির জন্ম। 'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল', 'হেমন্ত গোধূলি' কবির কাব্যগ্রন্থ।

বাংলার মাটিতে দুইটি বিভিন্ন সাধনার ধারা উদ্ভূত হইয়াছে। একটি বৈষ্ণব সাধনার ধারা, অন্যটি শাক্ত সাধনার ধারা। চণ্ডীদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিগণ প্রধানতঃ ঐ বৈষ্ণব সাধনার ধারাটিকেই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মোহিতলাল শাক্ত সাধনার যে ধারা, তাহারই অনুসারী। একটা বলিষ্ঠ জীবনবাদ এবং সুগভীর মর্ত্যপ্রীতি তাই এই কবির কাব্যের অন্যতম বিশেষত্ব হইয়া উঠিয়া উহাকে রবীন্দ্রকাব্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখের গায়ক হইবার দুর্নিবার বাসনা কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই ব্যক্ত হইয়াছে। ইঁহার কবিতার ছন্দসৌষ্ঠব এবং ভাবগভীরতা বিস্ময়কর।

**যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত**—আধুনিক বাংলা কাব্যে ভাবের মৌলিকতাবলে যাঁহারা সর্বাধিক পরিমাণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অন্যতম।

নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রামে কবির জন্ম হইয়াছিল। ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন। সেই জন্য কোন কোন কাব্য-সমালোচক ইহাকে 'ইঞ্জিনিয়ার কবি' এই আখ্যা দিয়াছেন। ইহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'। ইহার পর একে একে ইহার আর কয়েকখানি কাব্য প্রকাশিত হয়,—যেমন, 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ং'।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কাব্যসাধনার ফলে সৌন্দর্যসুষমার যে স্বর্গলোকের দ্বার আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, যতীন্দ্রনাথ সেদিক হইতে ফিরাইয়া আমাদিগকে রূঢ়-বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ইনি স্বীকার করিয়াছেন, ইহার কাব্যে ইনি প্রত্যক্ষ সত্যকে আমাদের গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত ভাবলোকসৃষ্টি ইহার প্রয়াস নহে। ভাবাকুলতা পরিহার করিয়া, যাহা বাস্তব তাহা রূঢ় বা পীড়াদায়ক হইলেও—উহাকে স্বীকার করাই তাঁহার প্রয়াস। তাঁহার দৃষ্টিতে জীবনে যাহা কিছু শ্রীহীন, কাব্যের ক্ষেত্রে তাহারও একটা স্থান আছে। কবি দারিদ্র্য ও রিক্ততার মধ্যে গৌরব খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

দুঃখবাদ তাঁর কাব্যে প্রবল। তিনি শরতের ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি, সুখ-সম্পদ দেখিতে পান না। দেখেন তাহার দুঃখসৃষ্টিকারী রূপটি। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, দুঃখ-বেদনাকে স্বীকার করিলেও, কবি তাহাতে ভাঙিয়া পড়েন নাই। দুঃখকে, অদৃষ্টকে, হাস্যমুখে পরিহাস করিবার শক্তি তাঁহার কবিতায় লক্ষিত হইয়াছে।

**যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়**—( ১৮৩৯-১৯০০ )—হুগলী জেলায় কোন্নগরে ইহার জন্ম। তিনভাগ 'পদ্যপাঠ' রচনা ও সঙ্কলন করিয়া ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে উৎকৃষ্ট

বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বড়ই অভাব ছিল। 'পদ্যপাঠে'র তিনটি ভাগ রচনা ও সঙ্কলন করিয়া ইনি পাঠ্যপুস্তকের সেই অভাব পূরণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

**রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**—( ১৮২৬-১৮৮৭ )—হুগলী জেলায় বাকুলিয়া গ্রামে কবির জন্ম। রঙ্গলাল অতিশয় সুপণ্ডিত ছিলেন—অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। অল্প বয়সেই ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'সুরসুন্দরী' নামক কাব্যত্রয় রচনা করিয়া ইনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। কালিদাসের সংস্কৃত 'কুমারসম্ভব' কাব্যের একখানি বাংলা অনুবাদও ইনি করিয়াছিলেন।

ইঁহার কবিতার মূল ভাব স্বদেশপ্রীতি এবং বীরত্বের প্রশংসা। এজন্য এক সময়ে ইঁহার কবিতা বাংলার ঘরে ঘরে আবৃত্তি হইত। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কাল হইতে বাংলা কবিতায় একটা কুরুচির ভাব অতিশয় প্রকট হইয়া উঠিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। রঙ্গলালের সাধনা ছিল—সেই কদর্য রুচি, গ্রাম্য ভাব ও অমার্জিত ভাষা হইতে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করিয়া শিক্ষিত রুচিবান্ সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তোলা। এই কার্যে তিনি সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন।

**রজনীকান্ত সেন**—( ১৮৬৫-১৯০১ )—পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে কবির জন্ম হয়। রজনীকান্তের পিতা সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, এবং কয়েকখানি গানের বই তিনি রচনা করিয়াছিলেন। পিতার নিকট হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া রজনীকান্ত বাল্যাবধি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। গান রচনা করিয়া রজনীকান্ত বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের

সময়ে ইনি বহু স্বদেশপ্রেম-উদ্বোধক গান রচনা করিয়া ও গাহিয়া দেশবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। হাস্যরসসৃষ্টিতেও ইঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। রজনীকান্ত বহু হাসির গানও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অভয়া' প্রভৃতি গ্রন্থ কবিকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**—( ১৮৬১-১৯৪১ )—বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জোড়াসাঁকোয় কবির জন্ম হয়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতামহ প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। ১৭ বৎসরের সময়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সেই সময় হইতে 'ভারতী' নামক পত্রিকায় বহু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করেন এবং লেখক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। ইহার পর সারাজীবন ধরিয়া তিনি অসংখ্য কাব্য কবিতা, নাটক নাটিকা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের সকল দৈন্য ঘুচাইয়া দেন। রসসৃষ্টির, রূপসৃষ্টির, সাহিত্য-বিচারের নব নব পন্থা প্রবর্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে নবীনতার আস্বাদ দিয়া সঞ্জীবিত, মুখরিত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছেন।

**সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**—( ১৮৮২-১৯২২ )—বাংলা ১২৮৮ সালের ৩০শে মাঘ কবি তাঁহার মাতুলালয়ে নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রজনীনাথ দত্ত, পিতামহ সুবিখ্যাত গদ্যলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ বহু বিদ্যায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার প্রবল পাঠানুরাগ ও ভাষা-শিক্ষার আগ্রহ ছিল। ১৯০১ সালে তাঁহার প্রথম কবিতা 'সবিতা', এবং ১৯০৫ সালে স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধিক্ষণ' কবিতা প্রকাশিত হয়। স্বদেশপ্রেম এবং ইতিহাস পুরাণের

কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বিষয়বস্তু। মৌলিকের ন্যায় সরস ও সুন্দর করিয়া অনুবাদ করিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল। নানা বিদেশী ভাষার কবিতা তিনি বাংলায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্‌ভিন্ন তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল নব নব ছন্দ রচনায় ও ছন্দ উদ্‌ভাবনে। বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'মণিমঞ্জুষা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'অভ্র-আবীর', 'তুলির লিখন', 'কুহু ও কেকা', 'বিদায়-আরতি', 'বেলাশেষের গান' প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। নাটক ও গদ্যরচনাও ইনি করিয়াছিলেন।

**সুকুমার রায়**—সাহিত্যে কৌতুকরস সৃষ্টি করা অত্যন্ত দুরূহ। এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন 'আবোল-তাবোলে'র কবি সুকুমার রায়। 'আবোল-তাবোল' এবং 'খাই-খাই' কবিতাগ্রন্থ দুইখানি রচনা করিয়া ইনি শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি সকলেরই অনাবিল হাসি ও আনন্দের রসদ দিয়া গিয়াছেন। 'পাগল দাশু', 'ঝালাপালা', 'অবাক-জলপান' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক গদ্যগ্রন্থও ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

**সুনির্মল বসু**—বর্তমান কালের একজন প্রখ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক।

**হুমায়ুন কবীর**—( ১৯০৬- )—কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করিয়া ইনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। বর্তমানে ইনি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরে সচিবরূপে কার্য করিতেছেন। 'পদ্মা' নামক কাব্য রচনা করিয়া ইনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও পত্রিকায়ও ইহার কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার রচিত 'সাথী' ও 'স্বপ্নসাধ' নামক দুইখানি পদ্যগ্রন্থ সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইয়াছে।

---